নীলিমার অগ্নিময়

জসিম মলিক

১.

আমার আসলে কোন কিছু হওয়ার কথা ছিলনা। ছোটবেলায় স্কুলে যখন 'এইম ইন লাইফ' রচনা লিখতে দিত তখন আমি বিরাট সমস্যায় পড়ে যেতাম। অনেকেই লিখত ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, পাইলট হবে। কিন্তু আমি কোনদিন এসব লিখিনি। কারণ তখনও আমি জানতাম না আমি কি হব, কি হতে চাই। আমার জীবনের লক্ষ্যটা ঠিক ছিলনা। এখন বিদেশে এসে কিছুটা হলেও সান্তনা পাওয়া যাচ্ছে যে তখন জীবনের লক্ষ্য ঠিক ছিল না বলে ভালই হয়েছে। যদি কিছু হয়ে যেতাম ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা লেখক তাহলে বিদেশ এসে সেটা যদি ধরে রাখা সম্ভব না হতো! কতজনইতো তা পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছেন মাছের ব্যবসায়ী, ডাক্তার হয়েছেন কমিউনিটি ওয়ার্কার, ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন ট্যাক্সি চালক বা সাংবাদিক হয়েছেন সিকিউরিটি অফিসার! জীবনের প্রয়োজনে, বাঁচার তাগিদে মানুষ তার পেশার পরিবর্তন করতেই পারে। বড় বড় স্বপ্নের সওদাগরদের এই স্বপ্নভঙ্গের জন্য আমার খারাপ লাগে। আরো খারাপ লাগে আমার মায়ের জন্য। আমার মাও চেয়েছিলেন কিছু একটা হই আমি। কিন্তু মায়ের সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। আমি কিছু হতে পারিনি। 'লেখক ও সাংবাদিক' কথাটা শুনতে খারাপ লাগেনা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বিদেশে এসবের কোন মূল্য নেই। সবটুকুই হচ্ছে সময়ের অপচয়। তবুও আনন্দের জন্যই এসব করা। আনন্দের জন্য মানুষ কি না করে।

তবে লেখালেখির একটা ভাল দিকও আছে। আমরা যারা একত্রে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম সেই সব হারানো বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ ঘটে যায় অকস্মাৎ! ওরা বিস্মিত হয়ে জানতে চায় আমি কি সেই! এছাড়াও নানাভাবে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হয়। চমৎকার সব নারী-পুরুষের সাথে ই-মেইলের মাধ্যমে অনুভূতিগুলো শেয়ার করা যায়। যাদের কোনোদিন দেখিনি, হয়ত কোনোদিন দেখবোওনা। অথচ আশ্চর্য্যজনকভাবে তারা আমার লেখা পড়তে পছন্দ করে।

আমার সুবিধা হচ্ছে আমি সহজেই মুগ্ধ হতে পারি। মানুষের প্রতি বিশ্বাসটা তৈরী হয়ে যায় দ্রুত। বিস্ময়বোধটা আমার পিছু ছাড়েনি। মানুষের কিছু কিছু গুনাবলী সত্যি মুগ্ধ হওয়ার মতো। আমার ধারণা মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস হারানো উচিত নয়। তবুও নানা কার্যকারণে মানুষ একে অন্যের প্রতি আস্থা হারায়। তারপর মানুষ একদিন একাকী হয়ে যায়।

মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাসের ভীতটা তৈরী হয় খুব ধীর গতিতে। কোনভাবেই একজন মানুষ অন্যের উপর পুরোপুরি আস্থা অর্জন করতে পারে না। এক ধরনের রহস্যময়তার ঘেরাটোপে মানুষ নিজেকে বন্দি করে রাখে। মেলে ধরতে পারে না। আস্থাহীনতায় ভোগে। বঞ্চিত করে নিজেকে। কিছুতেই নিজেকে নিজের মতো গড়তে পারে না। নিজের চাওয়াটাকে বাস্তব করতে পারে না। নিজের মতো করে আনন্দ উপভোগ করতে পারেনা। অনেক সীমাবদ্ধতা তাকে কুড়ে কুড়ে খায়।

২.

পেছনের দিকে যদি ফিরে তাকাই, শৈশবের কথা মনে পরলে কেমন মন খারাপ হয়ে যায়। তখন থেকেই আমার মধ্যে একটা শূন্যতা তৈরী হয়ে ছিল। সেই শূন্যতাটা আজও আছে। আমি এখনও কোলাহল থেকে দুরে থাকতেই পছন্দ করি। আমি আসলে একসঙ্গে অনেক কিছু নিতে পারি না। আমার জগৎটা ছিল বরাবারই খুব ক্ষুদ্র। একা একা ঘুরে বেড়াতাম বনে জঙ্গলে। গাছেদের সাথে কথা হতো। কথা বলতাম পাখীদের সাথে। মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াতাম। বরশি দিয়ে মাছ ধরতাম নিভৃতে। জোনাকী আর প্রজাপতির পিছু নিতাম। আমাদের বাড়ির পিছনে ছিল বিশাল জঙ্গল। তার মধ্যে একা একা ঘুরে বেড়াতাম আর রাজ্যের সব ফল কুড়াতাম। ছুটতাম কেটে যাওয়া ঘুড়ির পিছনে। মারবেল নিয়ে খেলতাম। সাইকেলের রিং চালাতাম রাস্তায়। বিয়ারিংয়ের গাড়ি বানিয়ে চালাতাম। সিগারেটের কাগজ দিয়ে চাড়া খেলেছি। বাই সাইকেল চালাতে গিয়ে হাত পা ছড়ে গেছে কত। সবই একা একা।

একবার একটা ছেলের হাতে চর খেয়েছিলাম। পাল্টা চর দেইনি। আমার মা শিখিয়েছিল কেউ কিছু বললে আমি যেনো কিছু না বলি। আমি প্রায়ই 'আমার মা আমার মা' কথাটা বলি কারণ আমার বাবা মারা গিয়েছেন আমার দুই বছর বয়সে। মাই আমার সব। কিন্তু আমি বহু দিন ধরে মায়ের কাছ থেকে দূরে দূরে। বড় হয়ে জেনেছি মায়ের এ অহিংস ধারণাটা ঠিক না। শিখদের একটি প্রবাদ আছে 'কেউ যদি তোমাকে অন্যায়ভাবে এক গালে একটি চড় মারে তুমি তার অন্য গালে চারটি চড় মেরো'। এখনও নানাভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হই। কিন্তু পাল্টা আঘাত আর দেওয়া হয় না। মায়ের জন্যই পারি না।

অনেক কিছুই আমার হতে ইচ্ছে করতো। একবার আমার খুব দর্জি হওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। কারণ দর্জিরা সুন্দর সুন্দর মেয়েদের জামার মাপ নেয় দেখে আমার খুব ঈর্ষা হতো। আর যেকোন সুন্দর মেয়ে দেখলেই আমি খুব উদাস হয়ে যেতাম। আজও হই। পৃথিবীর তাবৎ সুন্দর মেয়েগুলো আমার কেনো হবে না এই দুঃখ কখনোই যাবে না। এসব ভাবলে কেমন সব গন্ডগোল হয়ে যায়। হায়রে জীবনের কতগুলো সময় পার হয়ে এলাম। কিছুইতো করা হলো না, পাওয়া হলো না! এখনও জীবনের লক্ষই যে ঠিক হয়নি! 'এইম ইন লাইফ!!'

৩.

আমি একটু স্মৃতি তাড়িত হচ্ছি । স্মৃতি ছাড়া মানুষের আর কিইবা আছে! ছোটবেলায় মার সাথে যেতাম ঢাপরকাঠি গ্রামে। মামা বাড়ি। ভরা বর্ষার দিনে মাঠ ঘাট পানিতে টৈ টুম্বুর হয়ে যেতো। ঘোলা পানিতে মাঠ ঘাটকে মনে হতো সাগর। বড় বড় ঢেউ উঠতো। সন্ধ্যা নদীর এমন স্রোত ছিল যে বুক কেঁপে উঠতো। আমার যখন বাড়ির জন্য খুব মন খারাপ হতো তখন নদীর তীরে এসে বসে থাকতাম। দুপুরের দিকে একটা লঞ্চ ভোঁ দেয়ে এসে ঘাটে ভিরতো। বরিশাল-পটুয়াখালীর মধ্যে যাতায়াত করতো এই লঞ্চ। কিছু নারী পুরূষ লঞ্চ হতে নামতো আর কিছু উঠতো। তারপর কোথায় উধাও হয়ে যেতো নদীর বাঁকে। অনেকক্ষন ধরে লঞ্চের ইঞ্জিনের গুম গুম শব্দ কান পেতে শুনতাম। শব্দটা মিলিয়ে গেলে একধরণের হাহাকার বুকের মধ্যে বেজে উঠতো। একাট শূণ্যতা। ওই লঞ্চটার আসা যাওয়ার মধ্যেই বাড়ির সাথে একটা গোপন যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। মা আমাকে একা একা

যেতে দেবে না জানি; আবার বাড়িতে রেখে এসেছি খেলার সাথীদের। তাদের জন্য মন খারাপ হয়। কিন্তু ছোটদের কথা কেউ বুঝতে চায় না। বড়রা কখনো ছোটদের মন বোঝে না।
সন্ধ্যা নদীর সাথেও আমার অদ্ভুৎ এক সখ্যতা গড়ে উঠেছিল। মাঝিরা যখন আবদুল আলিমের মন খারাপ করা ..'মন পাখী তুই আর কতকাল থাকবি খাঁচাতে ..ও তুই উড়াল দিয়ে যারে পাখী বেলা থাকিতে..গান গাইতে গাইতে যেতো তখন আমার মনে হতো আহারে আমি কেনো মাঝি হলাম না। তাহলে দূরে কোথায় হারিয়ে যেতে পারতাম! আসলে অন্যে যা করতো আমার অবচেতন মন তাই করতে চাইত। ছোটবেলায় স্কুল পালিয়ে খুব সিনেমা দেখতাম। কবরী ছিল আমার খুব প্রিয়। মনে মনে ভাবতাম আহারে কবরী কত সুন্দর ! পরবর্তীকালে কবরীর ভুবনভোলানো হাসি নিয়ে অনেক লেখা লিখেছি। কবরীকে নিয়ে আমার অনেক গোপন স্বপ্ন ছিল। আসলে সুন্দর কিছু দেখলেই আমার মন কেমন করে।
কত কি যে ভর করতো মনে। আমি বরাবর একটু ইন্ট্রোভার্ট। সহজে কারো সামনে যেতে বা কিছু বলতে পারি না। নিজের জন্য পারি না কিছু চাইতে। আমাকে বোঝে এ রকম একজন মানুষও আমি পাইনি। আমার স্ত্রীও না। আমাকে বোঝা যেকোন মানুষের জন্য একটু কঠিন বটে। একবার ঠিক ষোল বছর বয়সের সময় একটি অসাধারন সুন্দর মেয়ের প্রেমে পড়ে গেলাম। তখন মাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছি। প্রেমে পড়ার ব্যাপারে কোন বাধা নেই। অনেকদিন এই প্রেমপর্ব চললো। কিন্তু পুরোটাই একতরফা। সেই মোমের মতো নরম মেয়েটি জানলোই না আমার হৃদয়ের প্রথম সেই আলোড়নের কথা। হৃদয়ের অনেক আকুলতাই অব্যক্ত রয়ে যায়।
আমি দুটো জিনিস কিছুতেই পারতাম না; একটি হচ্ছে হাতের তালুতে লাটিম ঘুরানো এবং অন্যটি হচ্ছে দু'আঙ্গুলে মারবেল তাক করে অন্য মারবেলকে ঠুকে দেওয়া। ছোটবেলায় মনে হতো এই দুটো জিনিস যদি পারতাম তাহলে জীবনটা সার্থক হতো। অন্যেরা পারে আমি কেনো পারিনা! আমি স্কুলে বার্ষিক খেলাধুলায় কোনদিন একটি পুরষ্কারও পাইনি। আমার খুব ইচ্ছে হয়েছিল ভাল হা ডু ডু খেলোয়ার হবো। কিন্তু হতে পারিনি।
৪.
হতে চেয়েছিলাম ফুটবল পেয়ার। দৌড় প্রতিযোগিতায় আমি বরাবার শেষের দিকে থাকতাম। আমার স্পিড ছিল খুবই কম। সেজন্য সামনের দিকে এগোনো হলোনা। হাইজাম্প খেলতে গিয়ে ব্যাকপেইন হয়ে গেলো। আগেই বলেছি মার সাথে মামা বাড়িতে গিয়ে থাকতাম বছরে দু'মাস। আমাদের প্রচুর ধান আসতো তখন গ্রাম থেকে। মা যেতেন তদারকি করতে। তখন একবার কৃষক হওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। তখন স্বপ্ন দেখতাম বড় হয়ে গ্রামের ঘোমটা টানা কোন মেয়ের সাথে আমার বিয়ে হবে। আমি হব আদর্শ কৃষক। কৃষকের স্ত্রী সকালবেলা সানকিতে পান্তা ভাত নিয়ে আসবে আমর জন্য ক্ষেতে। আমি পান্তাভাতের সাথে কাঁচামরিচ ডলে সেই ভাত খাব। সাথে থাকবে ক্ষেতের টাটকা সবজী আর পুকুরের মাছ। শীতের সকালের সেই জমাট বাধা তরকারির স্বাদই যে আলাদা।
ধানের আঁটি মাথায় নিয়ে ঘরে ফিরবো বেলা বাড়ার সাথে সাথে। ধান মারাতে গরুর পিছনে ছুটেছি কত। রাতে সিদ্দ ধানের ভিতরে টং বানিয়ে ওম ওম বিছানা পেতে মাঘের শীতে ঘুমিয়েছি। নৌকা

বেয়েছি খালে বিলে। গ্রাম দেশে বড় বড় তাল গাছের খোল দিয়ে ডোঙ্গা তৈরী হতো। সেগুলো বাইয়েছি। প্রায়ই তাল রাখতে না পেরে উল্টে পড়ে যেতাম পানিতে। চিনে জোকে ধরতো । সাপ আর চিনে জোক আমি খুব ভয় পেতাম। এখন অবশ্য মানুষ নামক প্রানীটিকে এই দুটোর চেয়েও বেশি ভয় পাই। কোন কোন মানুষ দেখলে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। পুকুরে ডুবে ডুবে মাছ ধরেছি। কলার ভেলার উপর শুয়ে আকাশ দেখেছি। শীতের বিকেলে ধান উঠে যাওয়া জমিতে খেলেছি গ্রামের আমার ভাইবোনদের সাথে। কাঁচি দিয়ে নাড়া কেটেছি। মাঝে মাঝে লুকিয়ে পাতার বিড়ি টেনেছি। নাড়া জ্বালিয়ে আগুন পোহায়েছি। শীতের কুয়াশা ভরা সকালে বিড়ির ধোঁয়া সত্যি অসাধারণ।

শনিবার হলে ছোটা মামার সাথে কলস কাঠির হাটে যেতাম। বিশাল বড় সে হাট। কত কি পাওয়া যেতো। মামা কত কি আমাকে কিনে দিত। পাস্টিকের খেলনা, লজেন্স। একটা খাবার খুবই সুস্বাদু ছিল মনে আছে, সেটা হলো মিষ্টি মুড়ি আর ঘোল। আহা কি সে স্বাদ! একবারের একটা ঘটনা কোনদিন ভুলবো না। ছোট মামার সাথে হাট থেকে ঘুরতে ঘুরতে বাড়িতে এসে পড়েছি। তখন রাত হয়ে গেছে। নৌকায় কলস কাঠির হাট থেকে যাওয়া আসা করতে ঘন্টা চারেক লাগে। বাড়িতে পৌঁছে মামা দেখলো আমার হাতের মুঠোয় একটা পিঁয়াজ বা আলু জাতীয় কিছু । আমি কোন দোকান থেকে নিয়ে এসেছি। মামা করলেন কি, আবার আমাকে নিয়ে গেলেন সেই রাতে কলস কাঠির হাটে। এবং যে দোকান থেকে আমি জিনিসটা এনেছি সেই দোকানে সেটা ফেরত দিয়ে এলেন। এই ঘটনাটা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। আহা সে এক অপূর্ব জীবন ছিল। সেই দিনগুলো আর ফিরবে না। এরকম হাজারো কান্ড করেছি এবং সেসব স্থায়ী করতে চেয়েছি জীবনে। কিন্তু কিছুই হয়নি।

৫.

নিষ্ঠা জিনিসটাই নেই আমার মধ্যে। আমার চারিদিকে কেবল সফল মানুষের ছড়াছড়ি। যার সাথে কথা বলি সেই দেখি বিরাট বড়। যেমন আমার এক পরিচিত লোক আছে প্রবাসে, সে পৃথিবীর সব বিষয়ে জানে। প্রথম প্রথম তার সাথে কথা বলে মনে হয়েছে এ রকম সবজান্তা মানুষও আছে! একবার সাহিত্য বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল। আমি গেলাম ঘাবরে। কারণ সাহিত্যের আমি তেমন কিছু জানি না। বাংলা সাহিত্যের সবই তার নখদর্পনে। নানা কথার পর আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তার কাছে জানতে চাইলাম, সে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই পড়েছে কিনা। বললাম খুব ভাল বই। আমাকে চমকে দিয়ে সে বললো এই নামের কোন লেখক বা কোন বইয়ের নামই সে শোনে্নি। এইসব বিদ্বান লোকদের দেখে বুঝতে পারি আমি কত অকিঞ্চিতকর।

বিশ্ববিদ্যালয়েও বন্ধুরা মিলে দিনভর টিএসসি আর লাইব্রেরী চত্বরে আড্ডা মেরে আর মেয়ে দেখেই সময় কাটাতাম। বিকেল হলে অনুরোধের আসরে দাঁড়িয়ে যেতাম রোকেয়া বা শামসুন্নহার হলের গেটে। বন্ধুদের সাথে ডাসের ফুসকা আর চটপটি খাওয়ার জন্য। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে পুলিশের পিটুনিও খেয়েছি। পুলিশের ছোড়া টিয়ার গ্যাস উল্টো ছুড়ে মারতাম পুলিশের দিকে।

এসবের পাশাপাশি ঘুড়ে বেড়ানোর একটা নেশা গড়ে উঠে আমার মধ্যে। ওই একটা জিনিস এখনও আমাকে ছেড়ে যায়নি। নিজের দেশতো বটেই পৃথিবীর অসংখ্য দেশ আমার ঘোরা হয়ে গেছে। কোনো এক নতুন জায়গার সকালটা কেমন এটা দেখার জন্য আমি ছুটে যাই এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। তাছাড়া ঘোরাঘুরির মধ্যে একধরনের পলায়নপরতা আছে। নিজের ব্যর্থতাগুলোকে ঢাকার জন্য দুরে সরে থাকা।

(আসলে ব্যর্থতার গল্প কোনোদিন শেষ হয়না। আর নিজের ব্যর্থতার গল্প বলে অন্যদের মন ভারাক্রন্ত করতে চাই না।)

jasim.mallik@gmail.com